রিট মামলা কে, কখন করতে পারবেন?

লিখেছেন: জ্যোতির্ময় বড়ুয়া | ডিসেম্বর ১২, ২০১৩ |

পেশা হিসেবে আইনজীবী আর ডাক্তারদের মধ্যে এক রকম সাযুজ্য আছে। দুটি পেশার মানুষরাই "মানুষের জীবন" নিয়ে কাজ করেন। তাই সতর্ক থাকতে হয়। পেশাজীবী হিসেবে আমাদের কাছের মানুষরা, কাছে পেলেই তাদের সমস্যার কথা বলেন, সমাধান জানতে চান। সামাজিক দায়িত্ব মনে করে আমরা সেসব সমাধানও দেয়ার চেষ্টা করি। ডাক্তারদের কাছে যেসব প্রশ্ন আসে তার বেশিরভাগই শরীরবৃত্তীয়। আইনজীবীদের কাছে আসা প্রশ্নগুলির অধিকাংশই সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত। মাঝে মাঝে ফৌজদারি, পারিবারিক ও অন্যান্য বিষয়েও জানতে চাওয়া হয়। এর বাইরে প্রফেশনাল পরামর্শতো আছেই। ইদানিং একটি বিষয়ে সবাই খুব জানতে চান- আর তা হল "হাইকোর্টে রিট" মামলা করা যায় কিনা? হ্যাঁ বা না-তে উত্তর দিলে সবাই খুশি হন না। আরও জানতে চান কিভাবে কি করা যায়? স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প পরিসরে সংবিধানের জটিল আইনের ব্যাখ্যা করে খোলাসা করে বোঝানো সম্ভব হয় না। তাই এই লেখার মাধ্যমে সেই খেদ কিছুটা হলেও পুরণের চেষ্টা করা হয়েছে। শুরুতেই বলে নেয়া ভাল, এই লেখার লক্ষ্য আইন পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী নন। তাই আইনী লেখায় যেসব আইনগত রেফারেন্স থাকা দরকার তা এখানে অনুপস্থিত। সাধারণ পাঠক যারা জানতে আগ্রহী অথচ জটিল আইনী কথার মারপ্যাঁচ পড়তে আগ্রহী নন, তাদের কথা ভেবে এই লেখা।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আইন বিষয়ে সবার জানার সুযোগ নেই। একজন দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক হয়েও দেশের বিদ্যমান আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন না। যদিও আমাদের সংবিধান ধরে নিচ্ছে- আপনি এদেশের নাগরিক হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে আপনি এদেশের সকল আইন মেনে চলবেন। আইন না জানলে মানবেন কিভাবে? খুব সুন্দর করে বলা হয় "ignorance of law cannot be an excuse." এ যেন শাঁখের করাত। রাষ্ট্র আপনাকে আইন বিষয়ে জানানোর বা শিক্ষিত করে তোলার সামগ্রিক দায়িত্ব নেয় না অথচ আশা করে আপনি সবটাই জানেন এবং মানবেন! এসব সীমাবদ্ধতা ছিল এবং এখনো আছে। আমাদের দেশে সব আইনই লিখিত। সরকার বর্তমানে তাদের ওয়েব সাইটে আইনগুলো প্রকাশ করছে, কিন্তু কতজন নাগরিক এখনো ইন্টারনেটে সেসব পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন? আর সে সংখ্যা যদি অনেক হয় তাতেও অসুবিধা আছে। আইনের পরিভাষা সহজবোধ্য নয় এবং এটি এখনো ইংরেজি ও ল্যাটিন ভাষার উপর নির্ভরশীল, এর সঠিক বাংলা পরিভাষা আমরা এখনো রপ্ত করতে পারিনি।

অনেকক্ষেত্রে বাংলা হিসেবে যেসব ভাষার ব্যবহার দেখি তা মূলত বাংলার খোলসে সংস্কৃত, ফার্সি, উর্দুর জগাখিচুড়ি। কোন কোন ইংরেজি আইনী শব্দের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ হয় না। অনুবাদকের মনগড়া বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের ফলে আইনের দুর্বোধ্যতা বাড়ে এবং দ্বৈত অর্থ প্রকাশের মাধ্যমে একে অনির্দিষ্ট করে তোলে। ফলে, পাঠক আরও বিভ্রান্ত হন। যেমনটি ধরা যাক, ডাক্তারি বিদ্যার অন্তর্গত একটি শব্দ, "Foreign Body", যারা এই শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ জানেন তাদের কথা আলাদা। কিন্তু কেউ যদি এর বাংলা হিসেবে লেখেন "বিদেশি সংস্থা" তাহলে গলার কাঁটা গলাতেই রয়ে যাবে। তাই বলে বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়ন থেমে থাকেনি। সাম্প্রতিক সময়ে করা অধিকাংশ আইনই বাংলায়। আইনগুলোর ইংরেজি ভার্সন থাকলেও আইনের নাম বাংলাতেই উচ্চারিত হয়, যেমন, "Madokdrobbyo Niyontron Ain." তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা এখনো ভাষাগত পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এর পেছনে অন্য অনেকগুলো কারণের সাথে আইনজীবীদের পেশার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাও কম দায়ী নয়।

অতি স্বল্প পরিসরে সবাইকে দেশের বিদ্যমান আইনের পরিপূর্ণ ধারণা দেয়া সম্ভব নয়। তাই এই আলোচনা কেবল রিট মামলা করার এখতিয়ার, কে, কখন করতে পারেন সেসব বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা হল। সাধারণের বোঝার সুবিধার্থে আইনী শব্দগুলোর দুর্বোধ্যতা পরিহার করে সাধারণ ভাষায় লেখা হয়েছে।
আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমুহ বলবৎ করার জন্যে ৪৪ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ১০২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পাঁচটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তার মানে, সংবিধানের তৃতীয় ভাগে কতিপয় মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণ বা স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যা নাগরিক হিসেবে আমি আপনি সবাই সমানভাবে ভোগ করার অধিকার রাখি। কি আছে সেসব মৌলিক অধিকারের তালিকায়? রিট বিষয়ে যাবার আগে মৌলিক অধিকারগুলো জেনে নেয়া যাক।
অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং সবাই সমান আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সকল নাগরিকের মধ্যে আইনের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যখনই কেউ আইনের সাম্য নষ্ট করেন তার বিরুদ্ধে এটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়, অন্তত কেতাবি অর্থে।
অনুচ্ছেদ ২৮, সকল ধর্ম, বর্ণ, নারী পুরুষ ও জন্মস্থান ভেদে রাষ্ট্র যেন বৈষম্য না করতে পারে তার বিধান দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৯, সরকারী পদে নিয়োগ লাভে সকল নাগরিকের সাম্যের নিশ্চয়তা দিয়েছে।
অনুচ্ছেদ ৩১, সকল নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনী প্রক্রিয়া ব্যতীত কোন নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটানো যাবে না। অর্থাৎ পুলিশ চাইলেই যে কাউকে তুলে নিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারবে না। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আইনী প্রক্রিয়া শুরু না করে কাউকে গ্রেপ্তারও করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ৩২, যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া ছাড়া কোন নাগরিকের ব্যক্তি ও জীবনের স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ৩৩, এখানে ব্যক্তির গ্রেপ্তার ও আটক বিষয়ে রক্ষাকবচ দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের কারণ যথাশীঘ্র উল্লেখ না করে আটক রাখতে পারবে না এবং তাকে তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া, আটকের পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আটককৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থাপন করবে পরবর্তী নির্দেশনার জন্য। তবে যদি তাকে কোন নিবর্তন মূলক আইনে আটক করা হয় বা সেই ব্যক্তি বর্তমানে দেশের শত্রু হয় তবে তার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। এটি সংবিধানের মূল ধারার সাথে সাংঘর্ষিক হলেও নিবর্তন মূলক আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে। কেনইবা এই স্ববিরোধীতা?

অনুচ্ছেদ ৩৪, এর মাধ্যমে বাধ্যতামুলক শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ জোর করে কাউকে দিয়ে শ্রম আদায় করতে পারবে না। এই অনুচ্ছেদে দুটি ব্যতিক্রম আছে- যেমন শ্রম যদি কারাভোগের অংশ হয় তাহলে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা যাবে আর দ্বিতীয়টি হল যদি জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তা আবশ্যক মনে হয়। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মনে করবে বাধ্যতামুলক শ্রম জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রয়োজন তা কোথাও উল্লেখ নেই। এখানে আইনের অস্পষ্টতা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৫, এর মাধ্যমে ফৌজদারি অপরাধের বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে যদি কোন কাজ অপরাধের পর্যায়ে না পড়ে তাহলে পরবর্তীতে নতুন আইন করে সেই কাজকে অপরাধ হিসেবে সজ্ঞায়িত করে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। একে আমরা ইংরেজিতে বলি "রেট্রোস্পেক্টিভ

ইফেক্ট", এই নিয়ম পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আছে। একই অনুচ্ছেদের ২ নং উপ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযোগের মাধ্যমে বিচার ও দণ্ড দেয়া যাবে না। অর্থাৎ কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির একবারই বিচার হবে। এই অনুচ্ছেদের ৪ নং উপ-অনুচ্ছেদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ- এতে বলা হয়েছে, কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৭ ধারা অনুযায়ী পুলিশ "রিমান্ড" নামক ভয়ানক পদ্ধতির মাধ্যমে যেসব স্বীকারোক্তি আদায় করেন এবং সেসব স্বীকারোক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? আইনের এই সাংঘর্ষিক অবস্থান বজায় রেখেই চলছে আমাদের ফৌজদারি শাসন ব্যবস্থা।

অনুচ্ছেদ ৩৬, এতে নাগরিকের আইনসংগত ভাবে বসবাস ও চলাফেরার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৭, এতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সভা সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৮, এর মাধ্যমে আইনসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সংগঠন করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৯, এর মাধ্যমে বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪০, এর মাধ্যমে পেশা বা বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪১, এর মাধ্যমে সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিধান করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪২, এর মাধ্যমে সম্পত্তির উপর নাগরিকের অধিকার এবং সেই সম্পত্তি রাষ্ট্র যেন বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও দখল করতে না পারে তার বিধান দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪৩, এর মাধ্যমে আইনগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে নাগরিকের গৃহে প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক থেকে নিরাপত্তাসহ চিঠিপত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিগত যোগাযোগের গোপনীয়তার অধিকার দেয়া হয়েছে।

এবার আসি রিট নিয়ে মূল আলোচনায়। আগেই বলেছি সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ মহামান্য হাইকোর্ট-কে কতিপয় ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দিয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে অনুচ্ছেদটি হুবহু তুলে দেয়া হল-
"অনুচ্ছেদ ১০২(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে-

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে-

(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন।"

উপরের অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়- হাইকোর্ট বিভাগ এমন কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেন যেখানে অন্য কোন আইনের মাধ্যমে কোন প্রকার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়নি। সংবিধান অনুযায়ী, কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তার আইনী প্রতিকার লাভের জন্য সর্বনিম্ন এক্তিয়ারাধীন আদালতে অভিযোগ দায়ের করবেন। যদি তিনি নিম্নআদালত সমুহের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি উপরের আদালতে যাবেন। অতএব দেখা যায়, সাধারণত হাইকোর্ট অভিযোগ দায়ের করার জন্য প্রাথমিক আদালত নয়। তবে কিছু কিছু বিষয়ে হাইকোর্ট প্রাথমিক বা বিশেষ অধিক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। তেমনই একটি অধিক্ষেত্র হল এই রিট।

অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(অ) অনুসারে, কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট, প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আইন বহির্ভূত কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য আদেশ দেয়া হয়। পক্ষান্তরে, এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশ আইনের দ্বারা তাঁর করণীয় কার্য করবার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারে। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নির্দেশনার সহাবস্থান রয়েছে এই অনুচ্ছেদে যা দুটি স্পষ্ট ক্ষেত্র নির্দেশ করে যাতে হাইকোর্ট তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। উদাহারণ স্বরূপ ধরা যাক- আপনি গ্রামে থাকেন, সেখানে সরকার নতুন রাস্তা বানাতে চায়। সেজন্য জমি অধিগ্রহণ করা দরকার। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মূল কর্মকর্তা হলেন ডেপুটি কমিশনার। তিনি প্রত্যাশী সংস্থার কাছ থেকে অনুরোধ পাওয়ার পর ভুমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ভুমি অধিগ্রহণের জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হবে তাদেরকে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ৩ ধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করবেন। সেই নোটিশ পাওয়ার পর যদি কারো কোন আপত্তি থাকে তা শুনবেন এবং সেসব আপত্তি নিষ্পত্তি করে তিনি উক্ত আইনের ৭ ধারায় ক্ষতিপূরণ গ্রহনের জন্য নোটিশ প্রদান করে ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। দেখা গেল- আপনি ৩ ধারার নোটিশ পাননি। যেসব প্রক্রিয়ায় নোটিশ জারি করার কথা আইনে বলা হয়েছে তা মোটেও অনুসরণ করা হয়নি। আপনি সরাসরি ৭ ধারার নোটিশ পেলেন। এটি নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট আইনের লঙ্ঘন। এখন বোঝা দরকার এতে কোন মৌলিক আইনটি ভঙ্গ হয়েছে? এক্ষেত্রে প্রধানত ভুমি অধিগ্রহণ আইন এবং সে সাথে সংবিধানের ২৭, ৩১ ও ৪২ নং অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে, যা ১০২(২)(ক)(অ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিকার পাওয়া সম্ভব।

এর পরে আছে, অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(আ), যাতে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হয়েছে বা গৃহীত হয়েছে ও তাঁর কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলে ঘোষণা করে হাইকোর্ট আদেশ দিতে পারবেন। এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে, প্রজাতন্ত্রের কোন কর্মচারীর আইন বহির্ভূত কাজের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১০২(২)(খ)(অ) অনুসারে, যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করে কোন ব্যক্তিকে আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে প্রহরায় আটক রাখা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রহরায়

আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। এটি সাধারণত বেআইনি আটকাদেশের বিরুদ্ধে নাগরিকের রক্ষাকবচ। কিন্তু নানান অজুহাতে বেআইনি আটক বন্ধ হয়নি। এটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার এক অব্যর্থ অস্ত্র বিধায়, আমাদের দেশের রাজনীতির গুণগত মান পরিবর্তন না হলে এর ব্যবহার কখনো বন্ধ হবে বলেও মনে হয় না।

অনুচ্ছেদ ১০২(২)(খ)(আ)-তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে- হাইকোর্ট বিভাগ, কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলে বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছেন বলে দাবী করছেন, তা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

উপরের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় বেশ স্পষ্ট, অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(অ)-(আ) এর অধীনে আবেদন করতে গেলে কোন ব্যক্তির নিজের সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ১০২(২)(খ)(অ)-(আ) এর অধীনে যে কেউ সংক্ষুব্ধ হয়ে হাইকোর্টের নিকট আবেদন করতে পারবেন।

এছাড়া, আরও একটি বিষয় পরিস্কার করে বোঝা দরকার তা হল- কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রিট মামলা চলে না। প্রতিপক্ষ হতে হবে রাষ্ট্র কিংবা তার কোন অঙ্গে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

আমাদের সংবিধান মূলত ব্রিটেন, ভারত ও মালয়েশিয়ার সংবিধানের আদলে রচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি কতটা সঠিক বা কার্যকর সেপ্রশ্ন ভিন্ন, কিন্তু এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ হচ্ছে কিনা সেটিই দেখার বিষয়। যেহেতু ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে তাই, কোন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান যদি আপনার মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করে তাহলে, আপনি রিট মামলা দায়ের করতে পারবেন না। আপনাকে যেতে হবে, দেওয়ানী আদালতে, যার দীর্ঘ প্রক্রিয়া আমদের কেবল নিরুৎসাহিতই করে না, বিচার প্রক্রিয়ার অসাড়তাও নির্দেশ করে। ধরে নেয়া যাক- আপনি একটি প্রাইভেট মেডিকেলে ডাক্তার হিসেবে কর্মরত আছেন। আপনি ৫ বছর সুনামের সাথে কাজ করার পর, ম্যানেজমেন্ট যদি কোন কারণে আপনার উপর ক্ষিপ্ত হন, তাহলে কোন প্রকার কারণ প্রদর্শন ছাড়াই আপনাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনার মনে হতেই পারে, এটি যদি সরকারী মেডিকেলে হয় তাহলে কি হবে? সহজ উত্তর তিনি রিট করার সুযোগ পাবেন, যার ফলাফল মোটামুটিভাবে দ্রুত। সাম্যের নামে এই অসাম্য কেন, তার উত্তর আমার জানা নেই।

উপরের আলোচনাটি মূলত সংবিধানের আলোকে রিট মামলার করার বিধান বিষয়ে সীমাবদ্ধ। এতে যৌক্তিক বিশ্লেষণ তেমন একটা নেই। রিট মামলা করতে পারার বিধান আর এর মাধ্যমে সত্যিকারের প্রতিকার পাওয়া এক বিষয় নয়। বর্তমানে সাধারণের স্বার্থে এর ব্যবহার হওয়ার পাশাপাশি এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহারও করা হচ্ছে। উদাহারণ হিসেবে ধরা যাক, সুন্দরবনের রামপালে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে অক্টোবর মাসে দায়সারাভাবে একটি রিট মামলা দায়ের করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে এই রিট মামলা দায়ের করার পেছনে বৃহৎ জনগণের স্বার্থ মনে করা হলেও দেখা যায় মামলাটি করার পূর্বে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও তার প্রভাব সম্পর্কে কোন প্রকার গবেষণা করা হয়নি। ফলে আশানুরুপ ফল পাওয়া যায়নি। শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ে এর ভবিষ্যৎ। এতে যারা এ বিষয়ে প্রতিবাদ করে আসছিলেন তাদের পক্ষ থেকে মামলা করার সুযোগটি নষ্ট হয়ে গেল। কেননা, একই বিষয়ে দুটি মামলা চলতে পারে না (যদি ভিন্ন কোন প্রতিকার চাওয়া না হয়)।

আমরা দেখি, রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতাসীন সরকারগুলো জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটিয়ে রাজনৈতিক বিচারে প্রজাতন্ত্রের কার্যাদি নির্বাহ করার কারণে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রচলিত আইনের ব্যত্যয় ঘটছে। বিগত পাঁচ বছরে কিংবা তারও আগের পাঁচ বছরে, কি পরিমাণ সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী ও,এস,ডি, বা কাজবিহীন অবস্থায় পাঁচটি বছর জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ করেছেন তা থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। নির্বাচন আসন্ন এবং পরবর্তী সরকার আসার পর এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা যায়। এছাড়াও, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গগুলো তাদের কার্য নির্বাহ করার সময়

অনেকক্ষেত্রে এমন সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। যেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্বই হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের সুবিধা-অসুবিধার দেখভাল করা সেখানে রাষ্ট্র নিপীড়কের ভুমিকা নেয়ার ফলে আদালতের কাছে সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যান্তর থাকে না। যে কারণে বর্তমানে মামলার সংখ্যা যেখানে পৌঁছেছে তার চূড়ান্ত নিস্পত্তি হতে সময় লাগবে অন্তত আগামী দশটি বছর। তাহলে মামলা করে কি লাভ হয়? এই ভাবনাটি মামলা দায়ের করার পূর্বের ভাবনা। এর সাথে মামলা দায়ের, পরিচালনা ও অপরাপর প্রক্রিয়া যুক্ত আছে। আপনি কি চান এবং কি পেতে পারেন তার ধারনার উপরই এসব প্রশ্নের উত্তর নির্ভরশীল। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এখানে কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছি। প্রথমত জানা দরকার, রিট মামলা দায়ের করার পর প্রথম শুনানির দিন কি আদেশ বা নির্দেশ পাওয়া যায় এবং সেটির আলাদা কোন গুরুত্ব আছে কি না? রিট মামলার ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, রিট মামলা করার পেছনে কারণ থাকে প্রাথমিক শুনানির দিনই যেন অপর পক্ষের কোন কাজের বিরুদ্ধে রুল জারির পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ পাওয়া যায়। "রুল" হল "কারণ দর্শানো নোটিশের" আদালতি ভাষা। দরুন আপনি শুধু মাত্র "রুল" পেলেন প্রাথমিক শুনানির দিন। তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার মামলাটি মূলত ঝুলে গেল। এই মামলা সকল নোটিশ জারি করার পর চূড়ান্ত শুনানির জন্য তৈরি হতে সময় লাগবে এবং যে পরিমাণ মামলা বিভিন্ন কোর্টের তালিকায় এখন চূড়ান্ত শুনানির জন্য অপেক্ষমাণ আছে তাতে, কোন কোর্ট নতুন কোন মামলা নিতে আগ্রহী হবেন কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ সময় ধরে মামলা চূড়ান্ত শুনানি না হওয়ার কারণে অনেক সময় মামলা করার মূল উদ্দেশ্যই হারিয়ে যায়। যেমন ধরুন, আপনি কোন এক সরকারী বিভাগে কর্মরত আছেন। নিয়ম অনুযায়ী আপনার পদোন্নতি হবার কথা, অথচ আপনাকে পদোন্নতি না দিয়ে আপনার পরের অবস্থানে থাকা ব্যক্তিকে পদোন্নতি দিয়ে দিল। আপনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিট মামলা দায়ের করলেন, আপনি সেই নিয়োগের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ পেলেন না, কেবল "রুল" পেলেন। মামলাটি ঝুলে রইল। ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ডিপার্টমেন্ট আপনাকেও পদোন্নতি দিল। এক্ষেত্রে ধরে নেয়া যাক, আইন আছে যে, একই বছরের মধ্যে যদি পদোন্নতি হয় তবে আপনার সিনিয়রিটি বজায় থাকবে। তাহলে আপনার রিট মামলা করার আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এক্ষেত্রে আদালতে আবেদনকারীর এবং রাষ্ট্রের যে ব্যয় তা পুরোটাই নেতিবাচক ব্যয়। তবে রিট মামলার মাধ্যমে কার্যকর সমাধান পাওয়ার তালিকাও কম দীর্ঘ নয়। মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করতে হয় "মাজদার হোসেন" মামলার কথা, যার মাধ্যমে আমাদের বিচার বিভাগ স্বাধীন হয়, তাছাড়াও সাম্প্রতিক কালে এমন অসংখ্য মামলার নজির আছে যার মাধ্যমে দেশে অনেক সমস্যার যুগান্তকারী সমাধান পাওয়া গেছে। সেসব নিয়ে পরে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে রইল।

ছোট্ট করে একটু বলে নেয়া দরকার- আদালতের কোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ যদি কেউ ভঙ্গ করেন তাহলে কি হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত অবমাননার জন্য নতুন করে একটি মামলা হয় আদেশ/নির্দেশ ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে, তাতে আদালত মামলার বিষয়বস্তুর আলোকে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক আদেশ দিতে পারেন। এসব মামলার ক্ষেত্রে প্রচলিত সমাধান হচ্ছে ভুল স্বীকার করে শর্তহীন ক্ষমা চাওয়া। অভিযোগের কোন একটি বিষয়ে যদি আপনি আপত্তি করেন তবে সেই মামলা উভরপক্ষের শুনানির মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রথমোক্ত সমাধানই বেছে নিতে দেখা যায়।

রিট বিষয়টি অনেক বিস্তৃত একটি আইনী বিধান। এত স্বল্প পরিসরে এর পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক কিছুটা ধারণা অন্তত এই লেখার মাধ্যমে পেতে পারেন, যা আরও জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।

সূত্র: ইন্টারনেট